একটি ফটোগ্রাফ

মোহাম্মদ ফখরুল হাসান

তাম্রলিপি

একটি ফটোগ্রাফ
মোহাম্মদ ফখরুল হাসান

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি : ৭২১

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ওয়ালিউল ইসলাম

বর্ণবিন্যাস :
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
ইন্টারনেট প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৫০০.০০

Ekti Photograph
By : Mohammad Fakhrul Hassan
First Published : Februay 2023 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 500.00 $15

ISBN : 978-984-97605-1-1

উ ৎ স র্গ

মাহমুদা বেগম রিনা

ভূমিকা

ধরনের দিক থেকে 'একটি ফটোগ্রাফ' একটি রোমান্সমূলক বিয়োগান্তক উপন্যাস। বৈচিত্র্যে ভরা গল্পটির প্রধান চরিত্র তাহসান ও টুনটুনি। বইয়ের প্রথম অংশে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন ছেলের বেড়ে ওঠা, ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনা, ভালো চাকরির স্বপ্ন পূরণ ও জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার শুদ্ধ অপেক্ষা এবং বিবাহ পরবর্তী প্রেমের রোমান্টিকতায় মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু শেষের অংশ পড়ে আবেগপ্রবণ হয়েছি। গল্পের শুরুর সুখস্মৃতি গল্পের শেষের জন্য আপনাকে অপ্রস্তুত করে তুলতে পারে। গল্পের প্রতিটি চরিত্রের উজ্জ্বলতা বইটিকে উপভোগ্য করেছে। লেখক পরম যত্নে যথাযথ শব্দচয়ন, উপমা ও রূপক দিয়ে প্রতিটি চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। তিনি এত সাবলীলভাবে চারপাশ, প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন যা বইটিকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।

অতি প্রিয়জন হাঁরানোর যে কষ্ট সেটা অন্যকে বোঝানো, বিশেষ করে লিখে প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন। লেখক সে অসাধ্য সাধন করেছেন। আগুনে পুড়ে নাকি সোনা খাঁটি হয়, ধারণা করি লেখকও শোকের অনলে পুড়ে দৃঢ়তর মানসিক শক্তির অধিকারী হয়েছেন। তিনি খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে একে একে তিনজন প্রিয় মানুষকে হারিয়েছেন। বাবাকে হারানোর খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে মাকে হারিয়েছেন। তারপর অনাকাঙ্ক্ষিত মরণব্যাধি ক্যান্সারে প্রাণপ্রিয় সহধর্মিণীকে হারিয়ে দুই মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ও শোকে মূহ্যমান লেখক চমৎকার বুনটে লিখেছেন সেই ট্রাজেডির কথা। উঠে এসেছে ভালোবাসার গভীরতার কথা এবং সম্পর্কে টানা-পোড়নে পরিমিতিবোধের কথা, যাতে নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকে পোর্টেট করা হয়েছে। বইটি পড়তে গিয়ে লেখকের সূক্ষ্ম রসবোধে হেসেছি, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান সংকট নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনায় আশান্বিত হয়েছি এবং শেষের দিকটায় মন এত ভারী হয়ে উঠেছিলো যে চোখ থেকে বারবার পানি গড়িয়ে পড়েছে।

লেখকের মতে জীবন একটা ডায়েরির মতো যা ভাগ্যের কালিতে প্রতিনিয়ত রচনা করতে হয়। এর মধ্যে মূল্যবান যে লেখাগুলো মানুষের কাজে লাগে সেগুলাই কেবল পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, আর বাকিগুলো কালের গহ্বরে হারিয়ে যায়। কেন্দ্রীয় চরিত্র তাহসানের জীবন নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণের প্রতিফলন পুরো গল্প জুড়ে স্পষ্ট ছিলো। ব্যক্তিজীবনের সুখ, দুঃখ, প্রেম, ভালোবাসা এবং প্রিয়জন হারানোর তীক্ষ্ম গভীর এই অনুভূতি তরুণ প্রজন্মের কাছে অবিশ্বাস্য লাগতে পারে। এভাবে কেউ কাউকে ভালাবাসতে পারে এবং প্রিয়জন হারানোর শূন্যতা ও হাহাকার এতবেশি হতে পারে আমি নিজেও আগে ভাবতে পারিনি। নব্য উপনিবেশিকতার আগে মানুষের মধ্যে এত প্রতিযোগিতা ও অহং ছিলো না, তখন মানুষের মধ্যে সত্যিকার প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিলো। সোশ্যাল মিডিয়ার এ যুগে সবকিছু কেমন মেকি হয়ে গেছে। সম্পর্কগুলোর ভিত্তি কেমন শো-অফ নির্ভর হয়ে গেছে। অথচ সম্পর্কের ভিত্তি হওয়ার কথা ছিলো দায়িত্ববোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

প্রয়াত বাবাকে আবেগঘন এক চিঠিতে তাহসান জীবন, মৃত্যু, আমাদের নিরন্তর ছুটে চলা এবং সময়ের ব্যবধানে সব ছেড়ে চলে যাওয়া নিয়ে নিজস্ব উপলব্ধির যেসব কথা লিখেছেন, সেসব কথা আপনাকে নাড়িয়ে দিতে পারে।

উপন্যাসের শুরুর দিকে লেখক সমাজে প্রচলিত বিয়ের জন্য মেয়ে দেখার রীতির সমালোচনা করেছেন। মেয়ে দেখতে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে না করার আগে, না করার সম্ভাব্য কারণগুলো আগেই তিনি খুঁজতে বলেছেন যাতে আনুষ্ঠানিকভাবে 'না' করার প্রয়োজন না হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে একটি মেয়েকে না বলা অত্যন্ত অপমানজনক।

বইটি পড়তে গিয়ে বরাবরই মনে হয়েছে তাহসান কখনোই একা ভালো থাকতে চাননি, ফলে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে উঠে এসেছে আমরা কেন পিছিয়ে, আমরা কীভাবে সামনে এগিয়ে যেতে পারি এবং আমরা কীভাবে আরও ভালো থাকতে পারি সেসব কথা।

বইটিতে একজন সাধারণ মানুষের আড়ালে একজন দার্শনিককে তুলে ধরা হয়েছে যিনি নিবিড়ভাবে দেশকে ভালোবাসেন, দেশকে নিয়ে ভাবেন এবং দেশের মানুষের কষ্টে দুঃখ পান। সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতি তুলে লেখক

অনমনীয় ঋজুতায় ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন কীভাবে আমরা বৈষম্যের বাংলাদেশ তৈরি করেছি, এখানে কেউ খাবারই জোগাড় করতে পারে না, আবার কেউ অন্যায়, দুর্নীতি করে প্রাচুর্যে ডুবে থাকে। এদেশের ব্যবসায়ীরা কীভাবে বিভিন্ন সময় নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে অতিমুনাফা করে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে সে কথাও তিনি বলেছেন। আবার সুযোগ না পেয়ে অনেকে সৎ, এ কথাও তিনি বলেছেন। আবার এদেশটা যতটুকু ভালো আছে তার পিছনে থাকা সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষদের কথাও তিনি নিঃসংকোচে স্বীকার করেছেন। তিনি শুধু সমস্যাই বলেননি, সমস্যাগুলো মোকাবিলার উপায়ও বাতলে দিয়েছেন। এছাড়াও আমাদের অতীত ও বর্তমান জীবনযাত্রার যে তুলনামূলক বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তা ভুলতে বসা শেকড়ের কথা মনে করিয়ে দিবে।

আমাদের ভেতরে বিরাজমান বিশ্বাস ও মৌলিক মূল্যবোধ যতক্ষণ না পরিবর্তন হয় ততক্ষণ আমরা কোনো কিছু থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করি না এবং আমরা পরিবর্তিত হই না। এ বইটা পাঠকের মৌলিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করে দিবে এমনটা আমি বলবো না, তবে আমি আশাবাদী যে এটি পাঠককে চিন্তার খোরাক যোগাবে, নতুন করে ভাবাবে।

দীর্ঘদিন ধরে হিসাববিজ্ঞান পড়ানো ব্যতিক্রমধর্মী এই মানুষটি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক এবং যিনি শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজের ক্লাস রুমে আমার চিন্তা-ভাবনায় সূক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এ জীবনটা ইতিবাচকতা ও নতুন স্বপ্নে বদলে দিয়েছিলেন। এ কৃতজ্ঞতা দৃঢ়চিত্তে একজীবনের পুরোটা জুড়ে আমি স্বীকার করতে চাই। আমি লেখকের ব্যক্তি জীবনে এবং বইয়ের প্রতিটি লাইনে লাইনে হিসাববিজ্ঞানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার মতো মূলনীতিগুলোর প্রতিফলন দেখেছি। আমি বইটির সফলতা কামনা করি এবং আশা করছি লেখক আমাদেরকে আরও নতুন নতুন বই উপহার দিবেন।

জোনাইদ আল হাবীব
বিবিএ, এমবিএ, আইবিএ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারি ০৫, ২০২৩

ফটোগ্রাফটি রিডিং টেবিলের ওপর একটি বই দিয়ে চাপা দেওয়া। ঘরে ঢুকেই তাহসানের চোখ পড়লো টেবিলের ওপর। বইটি তুলে ছবিটি দেখতে যাবে ঠিক তখনি কী মনে করে যেন রেখে দিল। হয়তো ভাবলো, একটু ফ্রেশ হয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে। হাতের ব্যাগটা রেখে সোজা চলে গেল মায়ের রুমে। মা-বাবার সাথে কথা বলে তাহসান ফ্রেশ হতে গেল। ইতোমধ্যে তাহসানের মা একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল ছবিটি ছেলের নজর কাড়লো কি না। তাহসান ফ্রেশ হয়ে একটু আয়েশি ভঙ্গিতে টেবিল থেকে ছবিটি নিল। বিছনায় বালিশে হেলান দিয়ে মুগ্ধ হয়ে ছবিটির দিকে তাকালো। তাহসান যখন ছবিটি হাতে নিল সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে লুকিয়ে পড়েছে। দিনের আলোকে গ্রাস করার জন্য অন্ধকারের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৃথিবীতে সন্ধ্যা নামবে। শেষ বিকেলের আলো ইতোমধ্যে পরাজিত হয়ে পশ্চিম আকাশে লাল আভা ছড়িয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যাতারার আবির্ভাব কিছুক্ষণের মধ্যে দৃশ্যমান হবে। প্রকৃতির যখন এমনি এক অবস্থা, তাহসানের চোখ তখন ফটোগ্রাফের সৌন্দর্যের মাঝে হারিয়ে গেছে। ছবিটিতে তাহসানের দৃষ্টি কতক্ষণ আটকে ছিল তার সঠিক হিসাব না থাকলেও সময়টা নেহায়েত কম ছিল না। ফটোগ্রাফের অদৃশ্য মায়ায় সে ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে গেল। সে অনুভব করতে লাগলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপু' যেন 'হৈমন্তি'র হাত ধরে বসে আছে আর বলছে, 'আমি পাইলাম, ইহাকে পাইলাম'। আবার

মনে হচ্ছিল সে ফ্রান্সের লুভ্যর মিউজিয়ামে মোনালিসার ছবির দিকে তাকিয়ে আছে, আনমনে মোনালিসার হাসির রহস্য অবলোকন করছে। ছবির মেয়েটির স্নিগ্ধতার মায়া সময়কে যেন থমকে দিল ক্ষণিকের জন্য। এভাবে কেটে গেল স্বপ্নবিভোর একচিলতে সন্ধ্যা। নিজের অজান্তেই সেলফোনের ক্যামেরায় বন্দি হলো ফটোগ্রাফের মেয়েটি, ক্যাপশন দেওয়া হলো 'বউ'। মোবাইল মেমোরিতে সেভ হওয়ার সাথে সাথে তাহসানের হৃদয়ের গভীরেও সেভ হয়ে গেল ফটোগ্রাফটি। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ। তারপর বিছানা থেকে উঠে আবার মায়ের রুমে। মা, ছবিটি আমি দেখিছি, আমার ভালো লেগেছে। আমরা প্রস্তাবটি নিয়ে ভেবে দেখতে পারি।

দীর্ঘদিন পর মায়ের মনে আনন্দের ঝিলিক। সেই সাথে কীভাবে মেয়ে সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া যায় তার পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গেল। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের মতো মা প্রায়ই বলতো 'ভালো একটা চাকরি হলো এবার সুন্দর দেখে একটা বউ আন।' তাহসান জীবনকে নতুন করে ভাবতে ও সাজাতে একটু সময় নিচ্ছিল। মা প্রায়ই তার পছন্দের কথা জানতে চাইতো, যদিও মা-বাবার কাছে সে বেশ স্বচ্ছ ছিল। তারপরও মায়ের মন কভু অশান্ত, কভু প্রশান্ত; তাই বারবার তাহসানকে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন করতো। মাকে সে বলতো, তোমার এই আনস্মার্ট ছেলেকে কোন মেয়ে পছন্দ করবে? তাহসান সম্পর্কে একজন অভিভাবকের ভাষ্য ছিল এরকম, 'তোমার যদি অন্য কোনো ক্যাডারে চাকরি হতো তাহলে হয়তো আমরা ভেবে দেখতাম'; যদিও আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের তখন কোনো প্রয়োজন ছিলনা। সত্যিই তো একটি 'ভালো ছেলে' এই লেভেল ছাড়া তার তেমন কোনো আকর্ষণ ছিল না। 'ভালো ছেলে' ভালো ছেলে, শুধু এইটুকু দিয়ে কি জীবন চলে? না, জীবনে আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন। হয়তোবা কিছুটা আসল, কিছুটা মেকি; তারপরও থাকতে হবে। মানুষের মন ও মনের মানুষ দুটোই বড় অস্থির। সময়ের সাথে সাথে বদলাতে থাকে; কখনো কারণে, আবার কখনো অকারণে বদলায়। তাই প্রস্তুতিটা থাকতে হয় চূড়ান্ত। কখন যে কী হয়, তা আগে থেকে বলা যায় না। তাহসানের বন্ধুরা প্রায় সবাই ছিল বেশ স্মার্ট। বন্ধুদের কেউ কোনো মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার সময় তাহসানকে সঙ্গে নিত। তারা নিশ্চিত ছিল এতে কোনো রিস্ক নেই। মেয়েটি তাকে

ছেড়ে আশেপাশে ঝুঁকবে না। জীবন চলার পথে মনের আকাশে ধূমকেতুর মতো কেউ ক্ষণিকের রেখাপাত করেনি তা বললে নিজের কাছে মিথ্যাবাদী হয়ে যাবো। কিন্তু আয়নার সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দিলে জীবনের সব ভালো লাগা হৃদয়ের গহিনে চাপা পড়তো; মনের রংধনুর প্রতিটি বর্ণ মুহূর্তেই বিবর্ণ হয়ে যেত। হৃদয়ের আকুতি রূপ নিত এক নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাসে। আচরণে তা প্রকাশ পেলেও পেতে পারে, তবে আকৃষ্টহীন সময়স্রোতের অতল গহ্বরে তা হারিয়ে গেছে বারবার।

চাকরি হওয়ার পর মায়ের কাছে প্রায়ই বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকলো। তাহসানের সময় নেওয়ার কথা ভেবে তা স্থগিতও হয়ে যেত। আবার মাঝে-মধ্যে তাহসানের সাথে শেয়ার করা হতো। সময় আজ তাহসানকে ভাবতে শেখালো, সে মাকে জানিয়ে দিলো তোমরা মেয়ে দেখো। তবে সেই সাথে স্পষ্ট করে এটাও বলে দিলো— বিয়ের জন্য সে মেয়ে দেখে বেড়াতে পারবে না। প্রচলিত ধারায় মেয়ে দেখে বেড়ানোটা সত্যিই মেয়েদের জন্য অপমানজনক আর ছেলেদের জন্য লজ্জার। অন্যদিকে যদিও কিছু কিছু ছেলে বিষয়টা বেশ এনজয় করে। তবে তাহসান বিষয়টি খুবই অপছন্দ করে। ছেলে বা মেয়ে যেকোনো পক্ষের 'না' উত্তরটা অপর পক্ষের অপমানের মাত্রাটা আরো বড়িয়ে দেয়। দেখলেই পছন্দ হবে এমনটাতো আর সম্ভব নয়, আর এরূপ ভাবনাটাও অবান্তর, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে অপছন্দ করাটা মোটেই সমীচীন নয়। সে মাকে বলত, আমার বোনকে দেখে কেউ যদি 'না' শব্দটি বলে চলে যায় তখন কেমন লাগবে? অপছন্দের কারণগুলো যদি পূর্বেই বিবেচনা করা যায়, তাহলে আনুষ্ঠানিকতার কোনো মানেই হয় না। তাহসান মেয়ে দেখার বিষয়টি একটি মর্যাদাপূর্ণ পারস্পরিক পরিচয় পর্ব হিসেবে বিবেচনা করে, যা কিনা জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তটি নেওয়ার আগে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার একটি অংশমাত্র। মনে মনে সে ভেবে রেখেছে মেয়ে দেখা নামের প্রথম পরিচয়পর্বটি যেন ভেস্তে না যায়। আনুষ্ঠানিকতার পূর্বেই বিবেচ্য সকল বিষয় ভেবে দেখার জন্য উভয় পক্ষকে বলে দেওয়া হলো। যদিও সময়ের সাথে সাথে মানুষের ভালো লাগা, মন্দ লাগাগুলো বদলাতে থাকে, যেকোনো সময় কারো পৃথিবী কালো মেঘে ঢেকে যেতে পারে বা কালো আঁধারে ছেয়ে যেতে পারে

চারদিক। একসময় ভালো লাগার যে উপাদানটা চুম্বকের মতো পরস্পরকে টানে; তা কখনো কখনো হয়ে পড়ে সংসার জীবনকে নিরানন্দ করার অন্যতম উপাদান। তবে নিজের সামর্থ্যের প্রতি যার আস্থা আছে, অন্যের ভালো লাগা, মন্দ লাগার প্রতি যার শ্রদ্ধাবোধ থাকে সে কখনো খারাপ থাকতে পারে না; আর নির্লোভ সততা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারলে তো কথাই নেই।

সুখী হতে হলে, কী পেয়েছি বা কী পাইনি তা না ভেবে, ভাবতে হয় আপনজনের জন্য, এই পৃথিবীর মানুষের জন্য কতটুকুইবা দিতে পেরেছি। এরপরও যদি মনে আসে, আমি তো অনেক দিয়েছি; তখন ভাবতে হবে, সামর্থ্য শেষ হয়ে আমি কি নিঃস্ব হয়ে গেছি? আজ কেন পেতে ইচ্ছে করছে? চাঁদ যেমন সূর্যের আলো ধার করে আমাদের জন্য রুপালি জোছনা উপহার দেয়; আকাশ যেমন মেঘ হতে ভালোবাসায় বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবীকে আমাদের জন্য সজীব রাখছে; নদী যেমন জলের স্রোতোধারায় সভ্যতার সাক্ষী হয়ে আছে; আমাদেরকেও ঠিক তেমন হতে হবে, আকাশের মতো বিশাল, নদীর মতো গতিময় কিংবা বৃষ্টির মতো স্নিগ্ধ। এমনি ভাবনা তাহসানকে খুব উদ্বেলিত করতো। নিজের ওপর আত্মবিশ্বাসও ছিল প্রচণ্ড। সে প্রায়ই বলতো বিশ্বাস করলেও ঠকতে হয়, অবিশ্বাস করলেও ঠকতে হয়। তারপরও আমি মানুষকে বিশ্বাস করে যাব। বিশ্বাস করলে আর যাই হোক নিজের মাঝে, এই পৃথিবীর মাঝে বিশ্বাস শব্দটা বেঁচে থাকবে। দেখা যায় পৃথিবীতে বোকা ও সহজ-সরল মানুষগুলো জীবনযুদ্ধের নানা ক্ষেত্রে প্রতারিত হচ্ছে, পরাজিত হচ্ছে; কিন্তু সত্যিকার অর্থে প্রকৃত সুখের সান্নিধ্য কেবলে এইসব বোকা ও সহজ-সরল মানুষগুলোই পেয়ে থাকে। কখনো কখনো তাদের সারল্য এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যখন তারা কষ্ট ও অপমানের বর্ণ বুঝতে পারে না। অপরদিকে চালাক মানুষগুলো পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো থাকে। তাদের চতুরতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের জন্য একটা ভালো অবস্থান এনে দেয় এবং সবাই তাদের চাতুর্যতাকে সমীহ করে চলে। অন্যদিকে বোকা না হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যাদের বোকা ভেবে ভুল করে তাদের কষ্টবোধটা সংগত করণেই একটু বেশি। এই মানুষগুলোকে প্রতিনিয়ত নানা কষ্ট ও অপমান হাসিমুখে বরণ করেতে হয়, বুঝেও অনেক কিছু না বোঝার ভান করতে হয়।

মানুষের জীবনটা সত্যিকার অর্থে একটা ডায়েরির মতো। যেখানে ভাগ্যের কালি দিয়ে নিজ হাতে প্রতিনিয়ত লিখে যেতে হয়। আর মূল্যবান লেখাগুলোই পৃথিবী তার স্মৃতিতে ধারণ করে যুগ যুগ ধরে বয়ে বেড়ায়; মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়। জ্ঞানপিপাসু মানুষগুলো জ্ঞানের সন্ধানে সেখানে হাতড়ে বেড়ায়। অপরদিকে মূল্যহীন লেখাগুলো দিনশেষে পুরাতন খবরের কাগজের মতো কোথায় যে হারিয়ে যায় তার খবর কে রাখে? তারপরও কেন জানি কিছু কীর্তি স্বীকৃতি পায় না, কিছু অন্যায় ঘৃণা পায় না, কিছু সত্য জানা যায় না, কিছু ভালোবাসা প্রকাশ পায় না, কিছু স্মৃতি ভোলা যায় না, আবার কিছু ছবি মুছে ফেলা যায় না।

পরিকল্পনামাফিক সব এগিয়ে চলছে। তাহসানের হবু শ্বশুর একদিন মসজিদে তাহসানের পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে গেল। প্রতিদিনকার মতো সেদিনও সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লো। পড়ন্ত বিকেলে পৃথিবী যখন একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছিল তখনি মসজিদের আযানের আহ্বানে তাহসান অন্যান্য মুসল্লিদের মতোই আসরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে গেল। পড়নে খুবই ক্যাজুয়াল পোশাক। মেরুন কালারের ফতুয়ার সাথে সাদা ট্রাউজার। প্রথম কাতারের ডান পাশে কিছুটা মাঝামঝি জায়গায় তাহসান নামাজের জন্য বসলো। কিছুক্ষণ পর সাদা পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরা এক লোক ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলে তাহসানের পাশে এসে বসলো। লোকটি যে এই এলাকার নয় তা বোঝা গেল। কারণ এই এলাকার কেউ হলে তাহসান তাকে চিনতো। প্রতিদিন অপরিচিত অনেক মানুষই এই মসজিদে নামাজ পড়ে, কাজেই অপরিচিত এমন কেউ বিশেষ গুরুত্ব পাবে না এটাই স্বাভাবিক। নামাজ শেষে তাহসান যখন বাসায় গেল তখন তো বেশ অবাক। কিছুক্ষণ আগেই যে তার পাশে বসে নামাজ পড়েছে সেই লোকটি তার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলছে। পরে জানতে পেল উনি তার হবু শ্বশুর, ফটোগ্রাফের মিষ্টি মেয়েটির বাবা।

মেয়ে সম্পর্কেও কিছুটা খোঁজ পাওয়া গেল। তাহসানের ছোট ভাইটি জানালো মেয়েটি নাকি ছবির চেয়েও মিষ্টি। মেয়েটির বাসার কাছেই ছিলো ছাত্রদের জন্য একাধিক মেস। এমনি এক মেসে তাহসানের ছোট ভাইয়ের এক বন্ধু থাকে। মেসের ছেলেগুলো মেয়েটিকে তেমনভাবে

চিনতেই পারলো না। ছাত্রাবাস বা মেস হলো কোনো এলাকার মেয়েদের চৌদ্দগোষ্ঠীর তথ্য প্রদানের খুবই উপযুক্ত একটা উৎস। এলাকার কোন মেয়ে কার সাথে প্রেম করে; কোথায় কোথায় ডেটিং করে; কোন মেয়ের মা দজ্জাল টাইপের; কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকানো বিপজ্জনক; এমন কি কোন মেয়ে কখন গোসল করে, কখন ছাদে ওঠে, কখন প্রাইভেটে যায় ইত্যাদি সকল তথ্যের নির্ভরযোগ্য ভান্ডার হচ্ছে ছাত্রমেসগুলো। মেসের আড্ডার অন্যতম বিষয়বস্তু হচ্ছে এলাকার মেয়েদের হালচাল।

তাহসানের জীবনে প্রেম আসেনি তাই বলে যে কারো জীবনে প্রেম আসবে না তা ঠিক নয়। আর প্রেম করা তো দোষের কিছু নয়। যে মেয়েটিকে সে জীবনসঙ্গী হিসেবে পছন্দ করেছে তার জীবনেও প্রেম থাকতেই পারে। তবে প্রেমটা যদি একটু মাখামাখি পর্যায়ে হয়ে থাকে, আবার তা যদি হয় পরিচিত গণ্ডির মধ্যে; তাহলে সেটা হবে অনেকটাই অস্বস্তির কারণ। তাই সে মনে মনে চাইতো এমন কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে যার গণ্ডির মধ্যে তাকে যেতে হবে না; সে যেন হয় দূর দ্বীপবাসিনী। জীবনের সবকিছু কি ছক এঁকে করা যায়? না, কল্পনার ছকে জীবনের সবকিছু হয় না। তবে সে বিশ্বাস করতো, জীবনসঙ্গী হলো আত্মার একটা অংশ। আল্লাহ প্রত্যেককে তার মতো করেই জীবনসঙ্গী দিয়ে থাকে। নিজে থেকে যে যতটা সৎ, যতটা বিশ্বস্ত; তার জীবনসঙ্গীও ঠিক তেমনি! আশে-পাশে দৃষ্টি দিলেও পরিচিত গণ্ডির মধ্যে এই ধারণার কিছুটা সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে। কাজেই সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মাত্র পনেরো টাকা রিকশা ভাড়া সমপরিমাণ দূরত্বের একজনকে সে পছন্দ করলো। আরেকটা প্রশ্ন তাকে খুব ভাবাচ্ছে!! মেয়েটি কি স্বেচ্ছায় তাহসানের প্রতি প্রাথমিক সম্মতি জানিয়েছে? নাকি পারিবারিক চাপে রাজি হয়েছে? খুব ইচ্ছে করছে বিষয়টি জানতে। 'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়' কথাটা এবারও প্রমাণিত হলো। ওর বান্ধবীদের একটা সোর্স বিষয়টা নিশ্চিত করলো।

তাহসানের এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে সবকিছু ক্ষণিকের জন্য থমকে গিয়েছিল। কেটে গেল বেশ কয়েকটি দিন। ঝিমিয়ে পড়া দৃশ্যপট হঠাৎ